১৪ মে ২০২৩
৩০ বৈশাখ ১৪৩০
সংখ্যা ১০২
রবিবার

আজকের আলোচনার বিষয় হেলিকোব্যাক্টর পাইলোরি বা এইচ. পাইলোরি জীবাণু সংক্রমণ। সারা বিশ্বেই রয়েছে এর অস্তিত্ব। এইচ. পাইলোরি ক্রনিক অর্থাৎ দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখের সূত্রপাত করে। বলা যায় এটিই সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখ সৃষ্টিকারি ব্যাকটিরিয়া। আর এর আক্রমণস্থল পাকস্থলী

এইচ. পাইলোরিতে কাহিল পাকস্থলী

অধ্যাপক ডাঃ কিংশুক দাস

সিনিয়র গ্যাস্ট্রো-এন্টেরোলজিস্ট, হেপাটোলজিস্ট
ও ইন্টারভেনশনাল এন্ডোস্কোপিস্ট
অ্যাপোলো মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটাল, কলকাতা
সভাপতি, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ গ্যাস্ট্রো-এন্টেরোলজি (পশ্চিমবঙ্গ চ্যাপ্টার)

কীভাবে এলো এইচ. পাইলোরি?

ডাঃ দাস: আজ থেকে আটান্ন হাজার বছর আগে আফ্রিকাতে প্রথম এই জীবাণুর সন্ধান মেলে। এরপর ত্রিশ হাজার বছর আগে ইউরোপে, কুড়ি হাজার বছর আগে আমেরিকা ও মিডল ইস্ট এবং দশ হাজার বছর আগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে নিজের অস্তিত্ব জানান দেয় এইচ. পাইলোরি। তবে মনে করা হয় এইচ. পাইলোরির বংশধরদের অস্তিত্ব পৃথিবীতে মানুষের আসার অনেক আগে থেকেই ছিল। মানুষের আবির্ভাবের পর পাকস্থলীতেই ছিল এর সহাবস্থান। মানুষ যখন ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকল, খেতে শুরু করল রকমারি খাবারদাবার, ওষুধপত্র; তখন জীবাণুর ওপর আঘাত আসতে থাকল। জীবাণুও তখন নিজেকে বদলাতে শুরু করল, সূচনা হল পাকস্থলীর অসুখের। ১৯৮২-৮৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার পার্থে মাইক্রোস্কোপের নীচে প্রথম এইচ. পাইলোরি জীবাণু আবিষ্কার করেন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ ব্যারি মার্শাল ও প্যাথোলজিস্ট ডাঃ রবিন ওয়ারেন। আর এর জন্য তাঁরা ২০০৫ সালে পান মেডিসিনে নোবেল পুরস্কার।

আমাদের দেশে বা বিদেশে এইচ. পাইলোরির প্রভাব কেমন?

ডাঃ দাস: আমাদের দেশে প্রায় ৭০-৮০% মানুষ কোনও না কোনও সময় এইচ. পাইলোরি সংক্রমণে আক্রান্ত হন। বিদেশে কানাডা, অস্ট্রেলিয়াতে ২০% এবং অন্যান্য দেশে ৫০-৬০% মানুষ এইচ. পাইলোরি সংক্রমণে ভোগেন। আফ্রিকার পাশাপাশি এখন ভারতেও এই সংক্রমণের প্রকোপ বাড়ছে। তাইওয়ান, চীনের অধিকাংশ জায়গাতেই এই জীবাণুকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে হাইজিন অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় নজরদারি এবং চিকিৎসার মাধ্যমে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে উন্নয়নশীল দেশ যেমন ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ইত্যাদি দেশে চাইল্ডহুড অর্থাৎ ছোটবেলাতেই শরীরে এই জীবাণুর প্রবেশ ঘটে। মূলত দূষিত জল এবং খাবারের সঙ্গে এটি শরীরে ঢুকে পড়ে এবং শরীরে থেকে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তেমন কোনও ক্ষতিও করে না। ১০০ জনের মধ্যে ১০ থেকে ২০ জনের জীবাণু

সংক্রমণের কারণে পেটের অসুখ হতে পারে।

এইচ. পাইলোরি কীভাবে পাকস্থলীর ক্ষতি করে?

ডাঃ দাস: এইচ. পাইলোরি একটি ব্যাকটিরিয়া। এটি পাকস্থলীতে বসবাস করে, কিন্তু পাকস্থলীর কোষের মধ্যে প্রবেশ করে না। থাকে কোষের আস্তরণে। আর চলাফেরা করে ফ্লাজেলার মাধ্যমে। ব্যাকটিরিয়াটিতে প্রচুর পরিমাণে উৎসেচক এবং কেমিক্যাল থাকে, যা একে বাঁচতে সাহায্য করে। এই ব্যাকটিরিয়া 'সার্ভাইভ্যাল অফ দ্য ফিটেস্ট থিওরি'-র অন্যতম নিদর্শন। এইচ. পাইলোরি ইউরিয়েজ নামে একধরনের উৎসেচক

রবিবার
১৪ মে ২০২৩
৩০ বৈশাখ ১৪৩০
সংখ্যা ১০২
কালি কলম

নির্গত করে। এই উৎসেচক হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে নিউট্রালাইজ বা নিষ্ক্রিয় করে। ব্যাকটিরিয়ার আস্তরণে থাকে লাইপোপলিস্যাকারাইড ও পেপটিডোগ্লাইকন, যা একে পাকস্থলীতে থাকতে সাহায্য করে। আর এইচ. পাইলোরির থেকে নিঃসরণ হওয়া CagA ও VacA পাকস্থলীর মিউকোসার ক্ষতি করে এবং আলসার, ক্যান্সার ইত্যাদির সূত্রপাত করে। এইচ. পাইলোরির প্রচণ্ড স্ট্র্যাটেজিক জীবাণু। পাকস্থলীর মধ্যে যেহেতু অ্যাসিড বেশি, তাই এটি ঝিল্লির আশপাশে চলে আসে অর্থাৎ যেখানে অ্যাসিড কম, পিএইচ অ্যালকালাইন। বাড়ির শত্রু যেমন বাইরে থেকে গুলি-গোলা চালিয়ে বাড়ির জিনিসপত্র ক্ষতি করে, তেমনই এইচ. পাইলোরিও পাকস্থলীর কোষের মধ্যে না ঢুকে বাইরে থেকেই পাকস্থলীর কোষের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। আর আমরা যদি একে মারতে অ্যান্টিবায়োটিক দিই তাহলে লুকিয়ে পড়ে। যাকে বলা হয় কোক্কয়েড ফর্ম।

কখন এটি মারাত্মক হয়ে ওঠে?

ডাঃ দাস: যদি আমরা ঘরের সাধারণ খাবার খাই, ব্যথার ও অ্যান্টিবায়োটিক

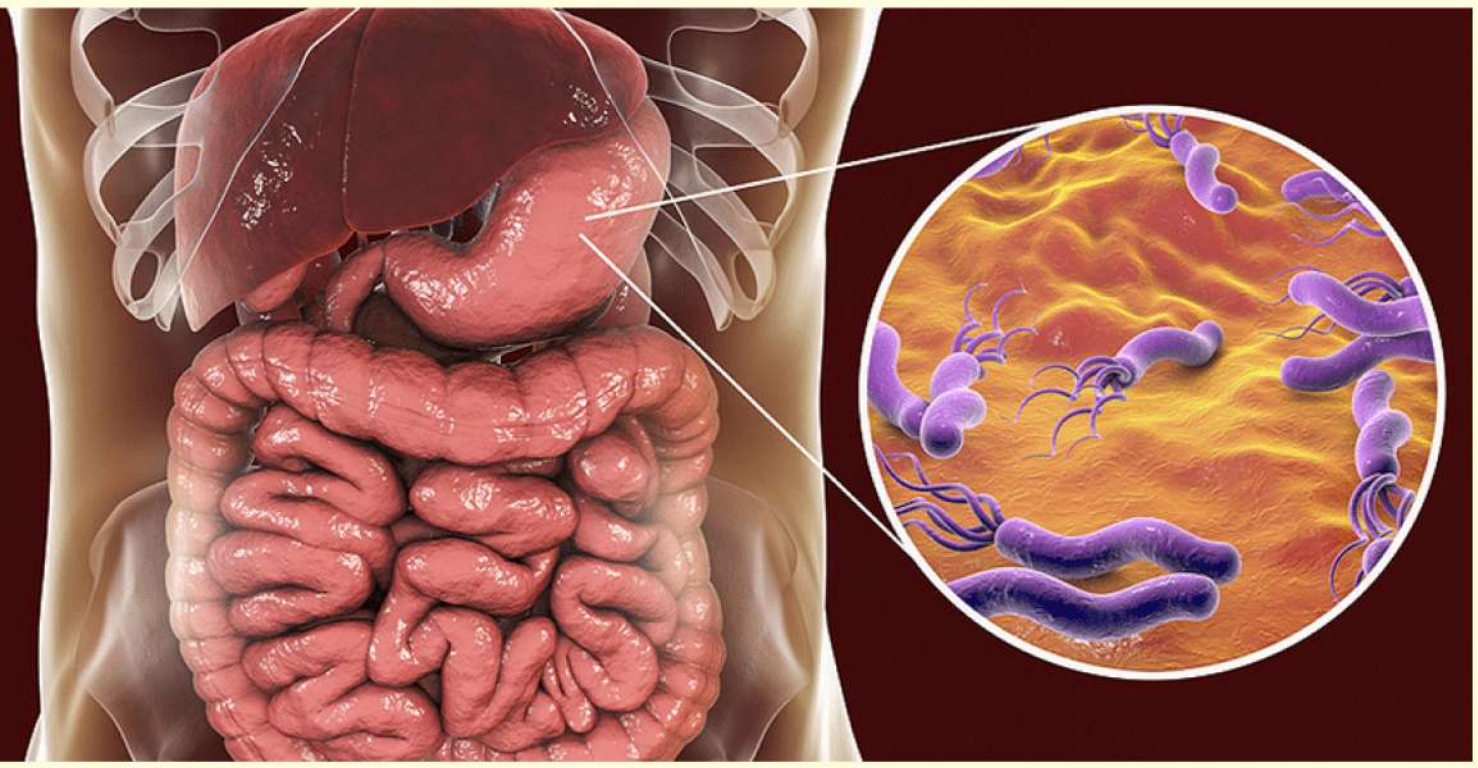

ওষুধ সেবন না করি, সতেজ শাকসবজি খাই, ধূমপান ও অ্যালকোহল থেকে দূরে থাকি; তখন কিন্তু এই ব্যাকটিরিয়া তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারে না। ইমিউন সিস্টেম ব্যাকটিরিয়াকে ক্ষতি করার কোনও সুযোগ দেয় না। সুস্থ থাকে পাকস্থলীর মিউকোসা। কিন্তু যদি বংশগত কারণে এইচ. পাইলোরি সংক্রমণে শরীরের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কেউ যদি ধূমপান ও মদ্যপান করেন, মাত্রাতিরিক্ত রেড মিট ও নুন দেওয়া খাবারদাবার খান, প্রচণ্ড স্ট্রেসের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকেন, ব্যথার ওষুধ ও অ্যান্টিবায়োটিক খান এবং অ্যাডিস নিয়ন্ত্রণের ওষুধ (প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর) খাওয়ার ফলে যদি পাকস্থলীর পিএইচ অ্যালকালাইন হয়ে যায়, তখন কিন্তু এই জীবাণু পাকস্থলীর ক্ষতি করতে শুরু করে। যাকে বলে ডিসবায়োসিস। শুরু হয়ে যায় ইমিউনোলজিক্যাল ড্যামেজ। তখন সিভিয়ার গ্যাস্ট্রাইটিস শুরু হয় এবং আলসার হতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যান্সারের ঝুঁকিও থাকে।

পাকস্থলীর কী কী ক্ষতি করতে পারে এইচ. পাইলোরি?

ডাঃ দাস: যুগ যুগ ধরে পাকস্থলীতে সহবস্থান করা এই ব্যাকটিরিয়া এখন পাকস্থলীতেই আঘাত হানছে। পাকস্থলীতে অ্যাসিড ক্ষরণ বেশি হলে অ্যান্ট্রাল গ্যাস্ট্রাইটিস, ডিওডিনামে আলসার হয়। আর যদি পাকস্থলীতে অ্যাসিড কম থাকে, তাহলে পুরো পাকস্থলীতে গ্যাস্ট্রাইটিস হয়, যা থেকে আলসার, অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস হতে পারে। আর সেগুলো কোষের ডিএনএ-তে আঘাত হানে, যার কারণে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। ক্যান্সার দু'ধরনের— অ্যাডিনো কার্সিনোমা এবং মল্ট লিম্ফোমা।

এটা কি শুধু পাকস্থলীর অভ্যন্তরেই ক্ষতি করে, না শরীরের অন্যান্য অর্গ্যানেরও ক্ষতি করে?

ডাঃ দাস: রক্তে বা শরীরের অন্যান্য জায়গায় না গিয়ে শুধুমাত্র পাকস্থলীর কোষের বাইরে অবস্থান করেও অন্যান্য অঙ্গে সমস্যা তৈরি করতে পারে এইচ. পাইলোরি। যেটা হয় সাব ক্লিনিক্যাল ইনফ্লামেশনের জন্য। এটি কোষের মধ্যে প্রবেশ না করে বাইরে থাকেই যাবতীয় ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড সেরে ফেলে। এইচ. পাইলোরির প্রভাবে শরীরে আয়রন ঘাটতি, প্লেটলেট কাউন্ট কমে যাওয়া, ইনস্যুলিন রেজিস্ট্যান্সের ফলে ডায়াবেটিস, ওবেসিটি, ডিসলিপিডিমিয়া, ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজ, ব্রেনের স্ট্রোক, পার্কিনসন, অ্যালঝাইমার্স, সিওপিডি, ব্রঙ্কাইটিস, অ্যালার্জি, ত্বকের অসুখ— এতগুলো সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে। এই ব্যাকটিরিয়া থেকে যেমন পাকস্থলীর ক্যান্সার হয়, তেমনই পরোক্ষভাবে কোলন ক্যান্সারও হতে পারে। তবে এর থেকে কেন কোলন ক্যান্সার হয়, তার কারণ এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি।

এইচ. পাইলোরি যার শরীরে ঢুকবে তাকেই কি ভোগাবে?

ডাঃ দাস: একদমই নয়। ১০০ জনের যদি সংক্রমণ হয় তাহলে ১৬ জন অর্থাৎ ৬ জনে ১ জনের গ্যাস্ট্রাইটিস, ডিওডিনাম বা পাকস্থলীতে আলসার হয়।

এই ব্যাকটিরিয়ার প্রভাবে কী কী কষ্ট হতে পারে?

ডাঃ দাস: এইচ. পাইলোরি নীরবে নিজের কাজ সাড়ে। অ্যালকোহল, হেপাটাইটিস ভাইরাস যেমন নীরবে লিভারের ক্ষতি করে, তেমনই এইচ. পাইলোরি পাকস্থলীতে বসবাস করে নীরবে পাকস্থলীর ক্ষতি করে চলে। দেখা দেয় না তেমন কোনও উপসর্গ। অ্যাকিউট বা ক্ষণস্থায়ী সংক্রমণে কদাচিৎ উপসর্গ দেখা দেয়। এইচ. পাইলোরি দূষিত জল বা খাবারের মাধ্যমে শরীরে ঢুকলে পেটের ওপরের অংশে ব্যথা, গা গোলানো, বমি বমিভাব, জ্বর জ্বরভাব, গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ, পাতলা পায়খানা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। যা তিন-চারদিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত থাকতে পারে। ক্রনিক সংক্রমণ হলে কারও কারও আলসার হয়। আর আলসার হলে পেটে ব্যথা, খিদে কমে বা বেড়ে যাওয়া, ডিওডিনাম আলসারে কালো পায়খানা ইত্যাদি হতে পারে। আজকাল আগেই চিকিৎসা শুরু করা হয় বলে অবস্ট্রাকশন খুব একটা দেখা যায় না।

রোগ নির্ণয় কীভাবে?

ডাঃ দাস: পেটে অস্বস্তি বা ব্যথা, খিদে কমে যাওয়া, বমি হওয়া, অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের কারণে কালো পায়খানা ইত্যাদি দেখা দিলে কারণ অনুসন্ধানে সবচেয়ে সহজ উপায় এন্ডোস্কোপি। ঘুম পাড়িয়ে এন্ডোস্কোপি করা হয়, রোগী বুঝতেও পারেন না। এন্ডোস্কোপি করে পাকস্থলীর বায়োপ্সি নিয়ে তার র‍্যাপিড ইউরিয়েজ টেস্ট (আরইউটি) করা হয়।

এন্ডোস্কোপি ছাড়া আর কি কোনও উপায় আছে?

ডাঃ দাস: এন্ডোস্কোপি ছাড়া রয়েছে স্টুল অ্যান্টিজেন টেস্ট। ১ গ্রাম স্টুল থেকেই এই পরীক্ষা করা সম্ভব। ২ বছর বা তার কম বয়সী বাচ্চা, যাদের সচরাচর এন্ডোস্কোপি করা হয় না, তাদের ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের সেরোলজিতেও অনেক সময় অ্যান্টিবডি দেখে বলা যায় শরীরে এইচ. পাইলোরি আছে কিনা। তবে এইচ. পালোরির জন্য নর্মাল অ্যান্টিবডি কত, সেই ভ্যালু আমরা জানিম না, যে কোনও সংক্রমণে অ্যান্টিবডির ভ্যালু বাড়ে, তবে বেস লাইন জানা না থাকলে সেরোলজিতে রোগ নির্ণয় সঠিক পদ্ধতি নয়। এছাড়া রয়েছে মলিকিউলার পদ্ধতি আরটিপিসিআর, এফআইএসএইচ ইত্যাদি। তবে স্টুল অ্যান্টিজেন টেস্টে রোগ নির্ণয় করা সবচেয়ে সহজ। এই পরীক্ষার আগে আলসারের ওষুধ, অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া চলবে না। চিকিৎসার পরেও স্টুল অ্যান্টিজেন টেস্ট করে দেখা হয় এইচ. পাইলোরি কী অবস্থায় রয়েছে। নতুন পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এসেছে বায়ো সেন্সর। এই ন্যানো টেকনোলজির মাধ্যমে বাড়িতেই পরীক্ষা করা সম্ভব। বহনযোগ্য এই পোর্টেবল স্মার্ট ডিভাইস বিদেশে এলেও ভারতে এখনও আসেনি।

কাদের টেস্ট করা হয়?

ডাঃ দাস: যাদের ডিওডিনামে আলসার, গ্যাস্ট্রিক আলসার, মল্ট লিম্ফোমা, অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস, ক্যান্সার আক্রান্তের বাড়ির লোক, যার পাকস্থলীর ক্যান্সার অপারেশন হয়েছে, গা গোলানো বা বমি বমিভাব, যাদের ব্যথা বা হার্টের ওষুধ খেতে

১৪ মে ২০২৩
৩০ বৈশাখ ১৪৩০
সংখ্যা ১০২

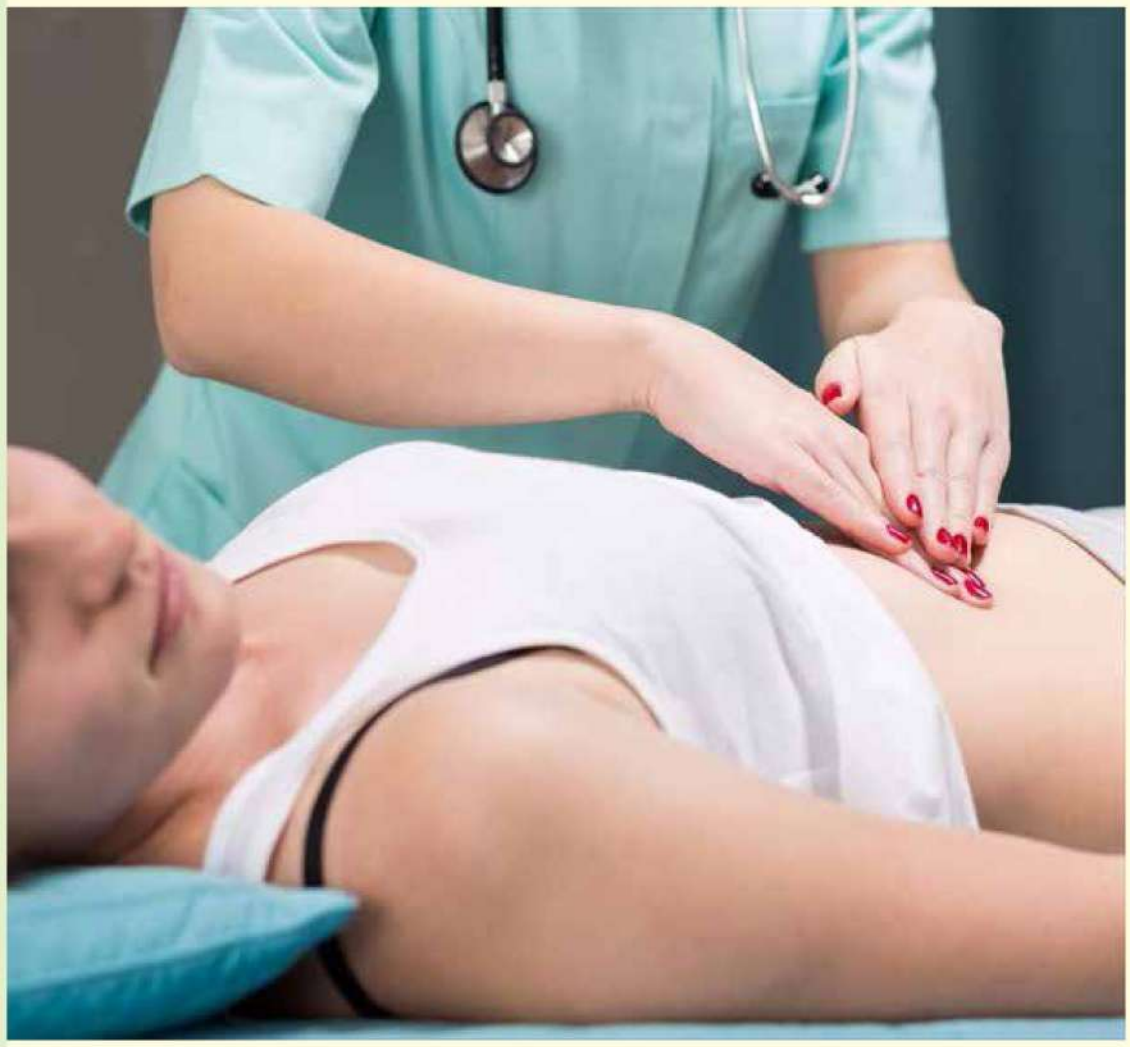

হয় এবং বাড়িতে বা কোনও নিকটাত্মীয়ের এইচ. পাইলোরি সংক্রমণ থাকলে তাদের টেস্ট করা দরকার। আর পেটে ব্যথার কারণে কোনও রোগী যদি এইচ. পাইলোরি পরীক্ষা করতে চান তখন টেস্ট করা হয়।

পেপটিক আলসার মানেই কি শুধু এইচ. পাইলোরি সংক্রমণ?

ডাঃ দাস: আগে বলা হতো পেপটিক আলসারের কারণ মানসিক চাপ। এরপর ১৯৮২-৮৩-তে জানা গেল এইচ. পাইলোরি থেকেই পেপটিক আলসার বেশি হয়। ডিওডিনাম আলসারের ৮০-৯০% আর গ্যাস্ট্রিক আলসারের ৫০-৬০%-এর জন্য দায়ী এইচ. পাইলোরি। চিকিৎসায় দেখা গেল আলসারে আক্রান্ত রোগীদের দু-সপ্তাহ এইচ. পাইলোরির চিকিৎসা করলে আলসার নির্মূল হয়ে যাচ্ছে। আগে আলসার নির্মূল করার কোনও উপায় ছিল না। ১৯৯০-এর পরে বলা হল পেপটিক আলসার সারা বিশ্ব থেকে নির্মূল হবে। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি, কারণ এইচ. পাইলোরি ছাড়াও পেপটিক আলসারের আরও অনেক কারণ আছে। যেমন ব্যথার ওষুধ, ধূমপান ইত্যাদি। তবে পেপটিক আলসারের অন্যতম প্রধান কারণ এইচ. পাইলোরি। এর সঙ্গে আরও জানিয়ে রাখি, চীনে এইচ. পাইলোরি পজেটিভ প্রায় ১,৬৩০ জনের ওপর সাড়ে ছাব্বিশ বছর ধরে একটি গবেষণা চালানো হয়। এই ১,৬৩০ জনের মধ্যে অর্ধেককে দু-সপ্তাহের চিকিৎসা দেওয়া হয় আর বাকি অর্ধেককে কোনও চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। এরপর দীর্ঘ অনুসন্ধানে দেখা যায় যাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে তাদের গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমেছে যাদের চিকিৎসা দেওয়া হয়নি তাদের তুলনায়। অর্থাৎ এটা প্রমাণ হল এইচ. পাইলোরিকে মেরে ফেললে গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সারের সম্ভাবনা কমে।

চিকিৎসা কী?

ডাঃ দাস: প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (প্যান্টোপ্রাজোল, র‍্যাবিপ্রাজোল, ওমিপ্রাজোল ইত্যাদি) দিনে দু'বার করে সকালে এবং রাতে খাবার আগে দেওয়া হয়। আর দু থেকে তিনধরনের অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয়। যেমন ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন ৫০০ মিলিগ্রাম দিনে দু'বার আর অ্যামক্সিসিলিন ১ গ্রাম করে দিনে দু'বার। ১৪ দিন পর্যন্ত চলে এই ওষুধ। কেউ কেউ এর বদলে মেট্রোনিডাজল দেয়। ৪০০ মিলিগ্রাম করে দিনে তিনবার। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেট্রোনিডাজল রেজিস্ট্যান্স দেখা যায় বলে এই ওষুধের ব্যবহার খুব কম হয়। এছাড়া যাদের ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন রেজিস্ট্যান্স আছে তাদের বিসমাথ দেওয়া হয়। বিসমাথের সঙ্গে থাকে প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর, টেট্রাসাইক্লিন আর মেট্রোনিডাজল। এছাড়া সিক্যুয়েন্সিয়াল থেরাপিও করা যেতে পারে। যেখানে প্রথম সপ্তাহ প্যান্টোপ্রোজাল জাতীয় ওষুধ আর অ্যামক্সিসিলিন দেওয়া হয় আর দ্বিতীয় সপ্তাহে প্যান্টোপ্রোজালের সঙ্গে দেওয়া হয় ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন। দু'সপ্তাহে দু'রকম অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার ফলে ব্যাকটিরিয়া ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। অ্যান্টিবায়োটিকও ভালো কাজ করে। একটানা একই ওষুধ না দিয়ে, বদলে বদলে ওষুধ দিলে অনেক সময় বেশ ভালো উপকার মেলে। এছাড়া রয়েছে হাইব্রিড থেরাপি, লিভোফ্লক্সাসিন। জাপানে এসে গেছে ভোনোপ্রাজন, যা আরও ভালো কাজ করে। চিকিৎসা শুরুর আগে দেখা হয় রোগী কোন এলাকার, তার কোনও অ্যালার্জি আছে কিনা। পেনিসিলিন অ্যালার্জি থাকলে অ্যামক্সিসিলিন দেওয়া যায় না। দেখতে হয় লিভোফ্লক্সাসিন, ক্ল্যারিথ্রোমাইসিন খেয়েছেন কিনা, যদি খেয়ে থাকেন তাহলে সেই ওষুধ আর দেওয়া যাবে না। ব্যাকটিরিয়া রেজিস্ট্যান্সের কারণে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ রোগীর ওষুধ কাজ করে না। প্রথমে যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় সেগুলো দ্বিতীয়বার আর কাজে লাগে না। একবার যে ওষুধ কাজ করে না সেই ওষুধ আবার দিলে তার কার্যকারিতা বা রেসপন্স ৫০%-এর নীচে নেমে যায়। এইচ.পাইলোরির চিকিৎসায় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স খুব গুরুত্বপূর্ণ। একে বলে এইচ.পাইলোরি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স। আমাদের দেশে অনেক ওষুধের রেজিস্ট্যান্স এতটাই বেশি যে, কার কোন ওষুধ কাজ করবে বা করবে না, সেটা আগে থেকে বোঝা খুব মুশকিল। আবার দেশের বিভিন্ন অংশে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্সের রকমফের রয়েছে। আর এইচ.পাইলোরিতে তিনধরনের অ্যান্টিবায়োটিকেই রেজিস্ট্যান্স (যার নাম মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট এইচ. পাইলোরি) রয়েছে সারা বিশ্বের প্রায় ১০% মানুষের। বিদেশে চিকিৎসা শুরুর আগে ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করা সম্ভব হলেও বিশাল জনবসতির এই দেশ তা সম্ভব নয়। দু'সপ্তাহ অর্থাৎ ১৪ দিনের ওষুধের কোর্স শেষ হওয়ার চার সপ্তাহ পর রোগীর স্টুল অ্যান্টিজেন টেস্ট বা ইউরিয়া ব্রেথ টেস্ট করা হয়। ১০০ জনের মধ্যে ৭০-৮০ জনের এইচ.পাইলোরি মরে গেলেও ২০-৩০ জনের থেকে যায়, তাদের আবার চিকিৎসা শুরু করতে হয়। প্রথমবারে দেওয়া অ্যান্টিবায়োটিকের বদলে তখন অন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। ওষুধ চলাকালীন গা গোলানো, বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা হতে পারে। এতে ওষুধ বন্ধ করা চলবে না। রোগীকে বোঝানো দু'সপ্তাহ ওষুধ খেতেই হবে। এইচ. পাইলোরির চিকিৎসায় বাজারে আসছে ন্যানো মেডিসিন। গবেষণায় আরও নতুন নতুন ওষুধ আনার চেষ্টা চলছে।

প্রতিরোধ কীভাবে?

ডাঃ দাস: প্রধান উপায় সচেতনতা বাড়ানো। গবেষণায় দেখা গেছে সারা বিশ্বের মাত্র ২৫-৩০% মানুষ জানেন এইচ.পাইলোরি নামক ব্যাকটিরিয়ার ব্যাপারে! এটি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ হ্যান্ড হাইজিন অর্থাৎ হাতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। গুরুত্বপূর্ণ খাবারের হাইজিনও। জলের মধ্যে এই ব্যাকটিরিয়া সাতদিনের বেশি বাঁচতে পারে। ভালো কোনও হোটেলের খাবার, বিয়েবাড়ির ভোজ, চরণামৃত ইত্যাদি থেকেও এইচ. পাইলোরি শরীরে ঢুকতে পারে। দরকার মাস স্ক্রিনিং। বাড়িতে বা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে টেস্ট করা। পজেটিভ হলে দ্রুত চিকিৎসা। তবে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিকাঠামোতে এটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। দু-একটা ভ্যাকসিন এলেও তাতে খুব একটা উপকার মিলছে না। কারণ ইমিউনিটিকে এড়িয়ে চলে এই ব্যাকটিরিয়া। শরীরের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চলার ক্ষমতা রয়েছে এইচ.পাইলোরির। দরকার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। ধূমপান, মদ্যপান ছাড়তেই হবে। মাত্রাতিরিক্ত রেড মিট খাওয়া চলবে না। আর তা না হলে ব্যাকটিরিয়া আরও জাকিয়ে বসবে পাকস্থলীতে। এখন রয়েছে কিছু কমপ্লিমেন্টারি মেডিসিন। যেমন মধু। এছাড়া রয়েছে প্রোবায়োটিক। বিদেশে এইচ. পাইলোরি থেকে ক্যান্সার হয় কিন্তু আমাদের দেশে এত বেশি সংক্রমণ হওয়া সত্ত্বেও ক্যান্সার খুব একটা হয় না। এটা একটা এনিগমা বা রহস্য! অবাক করা বিষয়! এর কারণ আজও অজানা। আমাদের মতো গরীব দেশে চ্যালেঞ্জ হল হাইজিন, অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স।

এইচ. পাইলোরিকে মারলে ক্ষতি কি কিছু হতে পারে?

ডাঃ দাস: গ্যাস্ট্রোইসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স ডিজিজ বেড়ে যায়, ইনটেস্টিনাল মাইক্রোফ্লোরার ক্ষতি হয়, ক্রনস ডিজিজ বেড়ে যায় ইত্যাদি। এছাড়া অ্যালার্জির সমস্যাও বাড়তে পারে।

শেষে সাধারণের উদ্দেশ্যে কী বলবেন?

ডাঃ দাস: সারা বিশ্বের সবচেয়ে কমন এবং জটিল ব্যাকটিরিয়া এইচ. পাইলোরি। মূলত দীর্ঘস্থায়ী পেটের অসুখের সূত্রপাত করে। ধূমপানের মতো এটিও ক্লাসওয়ান কার্সিনোজেন। কারণ এর থেকে ক্যান্সার হতে পারে। এ ছাড়া আগেই বলেছি এই ব্যাকটিরিয়ার কারণে পেপটিক ও গ্যাস্ট্রিক আলসার, মল্ট লিম্ফোমা হয়। ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দমিয়ে এই ব্যাকটিরিয়া ইনফ্লামেশন সৃষ্টি করে। সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্রনিক ইনফ্লামেশন। চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক হচ্ছে। ন্যানো টেকনোলজি আসছে। সেই সঙ্গে মানুষকেও সচেতন হতে হবে। বুঝতে হবে এবং ব্যাকটিরিয়াকে মারতে হবে। একজনের থেকে অন্যজনে যাতে না ছড়ায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। আর মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্টকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। চলুন সবাই হাতে হাত ধরে এগোই, এইচ. পাইলোরিকে জানি, ঝুঝি আর চিনি; আর তাহলেই এই জীবাণুর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধজয়ী হতে পারবো।

সাক্ষাৎকার: **প্রীতিময় রায়বর্মন**